ভগিনী নিবেদিতা : মেধা ও মননের এক সমুন্নত শিখর

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

আয়ারল্যান্ডের মেয়ে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল যেদিন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন তারপর কেটে গেছে দেড়শো বছরের অধিক সময়। আবার যেদিন তিনি প্রথম পা রেখেছিলেন আমাদের এই কলকাতা শহরে, সেও প্রায় সওয়া-শো বছর হতে চলল। আর বন্দর স্পর্শের সেই দিনটি থেকে মাত্র তেরো বছর পর, যেদিন তিনি দার্জিলিঙে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন—পেরিয়ে গেল তারও প্রায় একশো দশ বছর। অতি সংগত কারণেই বছর তিনেক আগে তাঁর আবির্ভাবের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নানা স্মরণ, শ্রদ্ধার্পণ ও উদ্‌যাপনের আয়োজন আমরা দেখেছি দেশে ও বিদেশে। সেসব কিছু অবশ্যই তাঁর জীবন ও কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রতি আমাদের বিনম্র কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। আজ যখন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে মাঝে মাঝে তাঁর নানা রচনার পাতায় চোখ রাখি, মনের গভীরে ধ্বনি ওঠে তাঁর অসামান্য নানা চিন্তার, চর্চার, ভাবনার এবং সর্বোপরি তাঁর সীমাহীন স্বপ্নের। তবে সবকিছুরই কেন্দ্রে সেই এক এবং অবিসংবাদী বিষয়—'ভারতবর্ষ'। স্বামীজী বলতেন 'My India'—যতদিন জীবন ছিল, স্বদেশ ছিল তাঁর আরাধ্য। চলে যাওয়ার আগে সেই তীব্র আকুতিময় ভালবাসা তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন কন্যাসমা শিষ্যাকে। শ্রীমতী বুলকে ১৬ জুলাই ১৯০৬ নিবেদিতা একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে তিনি নিজের রচিত গ্রন্থাদির বিষয়ে তাঁর ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, স্বামীজীর জীবনী রচনাই তাঁর প্রধানতম কাজ। তারপর তিনি স্থান দিয়েছিলেন 'Footfalls of Indian History' গ্রন্থটিকে। এই চিঠিতে তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছিলেন; বলেছিলেন, ''আমি জানি না তাঁর জীবনী ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থের পরিসরে তাঁর (স্বামীজী) শিক্ষা ও বাণীর সুগভীর মর্ম প্রকাশিত হবে—Kali [the Mother]-এর মতো কোনও স্বল্পপরিসর পুস্তিকার মধ্য দিয়ে, নাকি শিক্ষাবিষয়ক কোনও প্রবন্ধের আকারে।''

একটু সরে যাই। মন দিই 'The Master As I Saw Him' গ্রন্থের প্রতি। আমরা জানি স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাওয়ার সময় নিবেদিতাকে

সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল বাগবাজারে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত নারীবিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ। সেইসঙ্গে আর একটি কারণও আমরা অনুমান করে নিতে পারি। ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৮ থেকে এই দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যযাত্রার আগে পর্যন্ত স্বামীজী নিবেদিতাকে গড়ে তুলেছিলেন ভারতবর্ষের কাজে কায়মনোবাক্যে উপযুক্ত করে নিতে। নিবেদিতা-জীবনীর সঙ্গে পরিচিত পাঠক জানেন স্বামীজীর সেই শিক্ষার ধরন। স্নেহ, প্রীতি ও প্রশ্রয় যেমন ছিল সেই সান্নিধ্যে, সেইসঙ্গে ছিল কঠিন শাসন, তীব্র ঔদাসীন্য, আর মানসিক সংঘর্ষের আবহ। সময়ে সময়ে নিবেদিতা ধৈর্যহারা হয়েছেন—কেঁদেছেন, সয়েছেন। শেষ অবধি জয়ীও হয়েছেন। এই অগ্নিপরীক্ষার পর নিবেদিতার জীবনে এসেছিল স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষার সময়—কলকাতা থেকে ইংল্যান্ডের টিলবেরি বন্দর অভিমুখে বিয়াল্লিশ দিনের সমুদ্রযাত্রা। সে-অভিজ্ঞতার নির্যাস ধরা আছে তাঁর 'The Master' গ্রন্থে।

দুই

নিবেদিতার সমস্ত লেখার মধ্যে এক অসীম প্রজ্ঞার সহজ প্রকাশ আমাদের বারবার বিস্মিত করে। কত আপাত দুরূহ বিষয়কে তিনি এক সহজ আঁচড়ে প্রকাশ করেছেন। পড়তে পড়তে মনে হয় ঠিকই তো, এভাবে কখনও কেন দেখিনি! বস্তুত আমরা বেশিরভাগ মানুষই ঘটনার বহিঃপ্রকাশের দিকটি নিয়ে ব্যস্ত বা সন্তুষ্ট থাকি। সিস্টার প্রবেশ করতেন তার গভীরে, খুঁজে বার করতেন তার প্রকৃত কারণ, তার ব্যাপ্তি—আগ্রহী অথচ নির্মোহ দৃষ্টিতে। Footfalls of Indian History গ্রন্থের গোড়ায় মানুষের ইতিহাস কীভাবে তার আঞ্চলিক অবস্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেই প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার সারমর্ম—মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে তার জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে, সে-ইতিহাস জাতির অবচেতন সত্তায় লিখিত থাকে। তাই তার চারিত্রিক দিকটি বুঝতে আমাদের আলো ফেলতে হবে তার সেই ইতিহাসের দিকে। একই সহজ ভঙ্গিমায় বুঝিয়ে বলেছেন যে এ-বিশ্বে আমাদের চিন্তাভাবনারও একটি ভৌগোলিক অবস্থান বা বিন্যাস আছে। যেমন আছে পশুপক্ষী ও বৃক্ষাদির। প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভবগুলির প্রসঙ্গে নদীপথের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন যে সেগুলি ছিল যেন প্রকৃতিদত্ত রাজপথ—সভ্যতার শিরা-উপশিরা। মানবসভ্যতার এই প্রাচীনতম যাত্রাপথের গুরুত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, এমনকী বিংশ-শতাব্দীর রেল যোগাযোগব্যবস্থার অগ্রগতিও সেই প্রাচীন নদীভিত্তিক শহরগুলিকেই সংযুক্ত করেছে। বলেছেন, এশিয়ার ইতিহাসই এশিয়ার ভৌগোলিক দিকগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেয়।

পাঠক যদি অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত Footfalls গ্রন্থটি একবার হাতে তুলে নেন, দেখবেন সাত ইঞ্চি লম্বা ও পাঁচ ইঞ্চি চওড়া সেই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা কিঞ্চিদধিক আড়াইশো মাত্র। কিন্তু গ্রন্থের সেই নামমাত্র পরিধিতে বিবেকানন্দ-শিষ্যার প্রজ্ঞা, গভীর মনন, এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষ নামক দেশটির প্রতি তাঁর বাঁধভাঙা ভালবাসার যে-মানচিত্র ধরা আছে তা নিশ্চিত আমাদের মনোযোগ দাবি করে। সভ্যতার ইতিহাস প্রসঙ্গে কী অননুকরণীয় ভঙ্গিতে নিবেদিতা বিগত দুহাজার বছরের ইতিহাসে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও গতিপথের ধারাটিকে দুটি ভাগে চিহ্নিত করে বলছেন, একটি ইউরোপের উপকূলবর্তী মৎসজীবী অধিবাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, অপরটি মধ্য এশিয়া ও আরবদেশের উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের দ্বারা সৃষ্ট। সহজ বোধগম্য ভাষা আর নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে তিনি ক্রমেই পাঠককে নিয়ে গেছেন সেই প্রায় অনালোকিত ইতিহাসের আঙিনায়। উঠে এসেছে সাম্রাজ্যবাদের

শিকড়ের কথা। উঠে এসেছে Viking-দের উদ্ভবের ইতিহাস, এমনকী রোমানদের কথাও আমরা পেয়েছি। এইভাবেই ইউরোপীয় ইতিহাসের আলো-আঁধারির প্রসঙ্গে রোমান সভ্যতার পথ বেয়ে সিস্টার আমাদের নিয়ে গেছেন গ্রিসের কাহিনিতে। বলেছেন কার্টেজ (Carthage)-এর কথা, সেইসঙ্গে তুলে ধরেছেন প্রাচীন ফিনিসিয়ান ও ক্রেট (Crete)-এর প্রায় বিস্মৃত সভ্যতার কথা। আবার সেখান থেকে ফিরে গেছেন প্রাচীন মৎসজীবী এবং জলপথ বাণিজ্যের প্রসঙ্গে। মাত্র দুটি পাতায় ইউরোপীয় সভ্যতার চলনের হদিশ দিয়েই তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন মধ্য এশিয়া ও আরবের পশুপালন-নির্ভর সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের কাহিনিতে—অতি সংক্ষেপে, মাত্র দুটি পাতায়। কিন্তু তাতেই আমরা পেয়ে যাই এক স্পষ্ট চিত্র। ইসলাম ধর্মের উদ্ভব প্রসঙ্গে প্রফেট মহম্মদের কথা এবং জাতিগঠক হিসেবে এ-বিশ্বে তাঁর প্রশ্নাতীত শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি তুলে ধরেই তিনি উল্লেখ করেছেন কীভাবে সেই পথ ধরে সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তী নানা সাম্রাজ্যের—বাগদাদ, কনস্টানটিনোপল এবং কর্ডোভা। এইভাবেই ক্রমে এসেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মুসলমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার যোগসূত্রের কথা। সেইসঙ্গে জেনেছি এইসব আদিতে মূলত পশুপালক মানুষজন কীভাবে তাদের উপজাতি গোষ্ঠীমূলক জীবন ও পশুপালন-অভিজ্ঞতায় ভর করে ধীরে ধীরে জাতিতে পরিণত হয়েছে এবং পরবর্তী কালে হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। একইসঙ্গে নিবেদিতা শুনিয়েছেন কয়েকটি প্রায়ান্ধকার সভ্যতার কথা, যেমন Assyrian, Parthian ও Median। দেখিয়েছেন কীভাবে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পশুশিকারভিত্তিক জীবনযাত্রা ইউরোপীয় মৎসজীবী জাতির মতোই তাদের আক্রমণাত্মক মনোভাবের পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে ক্রমেই সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

সিস্টারের এই রচনার পরবর্তী অংশে আজ যাব না। আগ্রহী পাঠকের পক্ষে সেটি তাঁর রচনা থেকে আস্বাদন করাই ভাল। এ-অভিজ্ঞতার সুযোগ আমাদের অমলিন সম্পদ। কিন্তু প্রশ্ন করা যায়—'মানুষের ইতিহাস' শিরোনামে এই অল্পাধিক চার পাতার ক্যানভাসে এই অতুলনীয় চিত্র কেন আঁকলেন নিবেদিতা? অনুমানের স্বাধীনতা দিলে বলব—আমাদের শিক্ষিত করার জন্য তিনি কিছু Tools বা মাপকাঠি দিলেন। কারণ এর পরেই তিনি প্রবেশ করেছেন ভারতীয় ইতিহাস এবং তার শাশ্বত ঐতিহ্যের আঙিনায়—আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন অতুলনীয় কয়েকটি অধ্যায়। কিন্তু আগেই বলেছি, সেকথা আজ নয়।

তিন

এখন প্রশ্ন, লেখার শুরুতে হঠাৎ নিবেদিতার গ্রন্থ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য ও দৃষ্টিকোণ কেন তুলে ধরলাম? এর দুটি কারণ দেব। প্রথমত ইদানীং যতদূর দেখেছি সাধারণ্যে নিবেদিতার লেখালেখির উপর খুব একটা জোরালো আগ্রহ চোখে পড়েনি। এ যদি আমার দেখার ভুল হয়, আমি আনন্দিত হব। তবে অনেকের মুখে এর একটি কারণ জেনেছি—সেটি নাকি সিস্টারের ভাষা; অর্থাৎ তাঁর ইংরেজি নাকি অত্যন্ত কঠিন। প্রাক্তন প্রভুর ভাষায় আমার নিজস্ব দখল আর পাঁচজনের চেয়ে কিছু আলাদা নয়। তবে সামান্য আগ্রহ আর অনেকটাই প্রয়োজনের খাতিরে তাঁর দু-একটি রচনা আমায় পড়তে হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি ভাষায় তাঁর অবশ্যই একটি নিজস্বতা আছে। মনে হয়েছে সেটির উপর তাঁর সমসাময়িক কালের কিছুটা ছাপও হয়তো আছে; তদ্‌ব্যতীত তাঁর ধারালো ব্যক্তিত্ব এবং তীক্ষ্ণ মেধার প্রতিফলনের দিকটিও অস্বীকার করা যায় না। তবে সব মিলিয়ে

তাঁর ভাষার চলনের সামান্য আভাস পেলে যে-জগতে উপনীত হওয়া যায় তার বোধহয় কোনও তুলনা নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সক্ষম অনুবাদকেরাও নিবেদিতার রচনাদির প্রতি এখনও যথোচিত আগ্রহী হয়ে ওঠেননি। আশা রাখি এর পরিবর্তন হবে।

দ্বিতীয়ত, নিবেদিতার রচনা আজ আমাদের বড় বেশি করে পড়া দরকার। একথা শুধু তাঁর ইতিহাসচিন্তা সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। তাঁর সমাজচিন্তা, শিল্প ও শিক্ষাবিষয়ক ভাবনা এবং জীবনবোধের অজস্র উজ্জ্বল দিশার প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। আজ সচরাচর ভারতবর্ষে যে-ইতিহাসচর্চা হয়, বা বলা চলে যে-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেটির চর্চা হয়, সেটি অবশ্যই মূলত ব্রিটিশ। আমাদের সাহিত্যপাঠের ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ প্রভাবের কথা অস্বীকার করা যায় না। ঠিক একইভাবে এই প্রভাব যে অন্যান্য সারস্বত দৃষ্টিভঙ্গিতেও ছাপ রাখে না তাও নয়। এ-ঘটনা অতি স্বাভাবিক। দীর্ঘ পরাধীনতার প্রভাব যে-কোনও উপনিবেশের উপর পড়বেই। তাতে যে আমাদের উপকার হয়নি তাও নয়। কিন্তু সেই উপকারের পথ বেয়ে এক অপ্রয়োজনীয় মুখাপেক্ষী মনোভাব আমাদের বিবিধ বিদ্যাচর্চায় গেড়ে বসেছে। আজকে যে সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে তার কারণ আমরা আমেরিকান প্রভাবকেও বহুলাংশে স্বীকার করে নিয়েছি। একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে তাতে খুব একটা তফাত হয়নি। কারণ আজ আমরা পশ্চিমি দুনিয়া বলতে যা বুঝি সেটি প্রায় সর্বাংশে খ্রিস্টান পশ্চিম, যার নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা অধুনা আমেরিকার হাতে। ফলে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে আজ যা-কিছু আমরা গ্রহণ করছি সেটি 'ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি'র সঙ্গে 'আমেরিকান আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি'-র সংমিশ্রণ। বাকি পৃথিবীর দিকে আমরা যখন তাকাই, তা ভারতীয় ইতিহাসচর্চার প্রয়োজনেই হোক, অথবা প্রাচীন সভ্যতা বা ধর্মের উদ্ভব-ইতিহাসের সন্ধানেই হোক—আমরা এই খণ্ডিত আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণকেই গ্রহণ করতে বাধ্য হই। আছে, এর বাইরেও ইউরোপীয় ও আমেরিকান মানুষজন আছেন, ইতিহাসবিদ আছেন—যাঁরা অবশ্যই অন্যভাবে ভাবেন, আলোচনা করেন। কিন্তু সে-উজ্জ্বল অথচ ক্ষীণ কণ্ঠ আন্তর্গোলার্ধ দূরত্ব পেরিয়ে আমাদের সাধারণ্যে প্রায় অশ্রুতই থেকে যায়।

একটি গল্প বলি, স্বামীজীর অভিজ্ঞতা থেকে। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে তিনি লিখছেন, '' 'মাসপেরো' (Maspero)[১] বলে এক মহাপণ্ডিত, মিসর প্রত্নতত্ত্বের অতিপ্রতিষ্ঠ লেখক, 'ইস্তোয়ার আঁসিএন ওরিয়াঁতাল' [Histoire Anciene Oriental] বলে মিসর ও বাবিলদের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখেছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে উক্ত গ্রন্থের এক ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদের ইংরেজীতে তর্জমা পড়ি। এবার ব্রিটিশ মিউজিয়ামের (British Museum) এক অধ্যক্ষকে কয়েকখানি মিসর ও বাবিল-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মাসপেরোর গ্রন্থের কথা উল্লেখ হয়। তাতে আমার কাছে উক্ত গ্রন্থের তর্জমা আছে শুনে তিনি বললেন যে ওতে হবে না, অনুবাদক কিছু গোঁড়া ক্রিশ্চান; এজন্য যেখানে যেখানে মাসপেরোর অনুসন্ধান খ্রীষ্টধর্মকে আঘাত করে, সে সব গোলমাল করে দেওয়া আছে! মূল ফরাসী ভাষায় গ্রন্থ পড়তে বললেন। পড়ে দেখি তাইতো—এ যে বিষম সমস্যা। ধর্মগোঁড়ামিটুকু কেমন জিনিস জান তো?—সত্যাসত্য সব তাল পাকিয়ে যায়। সেই অবধি ও-সব গবেষণাগ্রন্থের তর্জমার ওপর অনেকটা শ্রদ্ধা কমে গেছে।"[২]

এই পক্ষপাতিত্বের চর্চা বা খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির ছায়া নিবেদিতার লেখায় নেই। কেন নেই? তার প্রধান কারণ তিনটি। তাঁর প্রখর প্রতিভা—বিশ্ব ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও শিল্প নিয়ে বিরামহীন আগ্রহ আর চর্চা, এবং সর্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দের দিগন্তবিস্তারী

শিক্ষা। কেমন ছিল সেই শিক্ষা সে-ইঙ্গিত খুব সংক্ষেপে দেব। তবে তার আগে স্বামীজীর কথা সামান্য বলা দরকার। তিনি খোলা চোখ আর সীমাহীন প্রজ্ঞা নিয়ে এই ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করতেন। পরিব্রাজক গ্রন্থের পাঠক জানেন রম্য ভাষার আড়ালে তাঁর সেই অভিজ্ঞতার দ্যুতি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব তাঁর মনোজগতের উপর অবশ্যই ছিল। কালের উত্তরাধিকার স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু নিজেকে তিনি সেই ঘেরাটোপে আবদ্ধ রাখার মানুষ ছিলেন না। প্রথাবদ্ধ শিক্ষা ও তৎস্পৃষ্ট ভাবনা-চর্চার মধ্যে বিচরণ করেও নিজস্ব ভুবনের সন্ধানে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। ছিল না বলেই ছুটেছিলেন দক্ষিণেশ্বর। ছিল না বলেই আমেরিকা থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে বলতে পেরেছিলেন : "I am the one man who dared defend his country, and I have given them such ideas as they never expected from a Hindu."[৩] এই আত্মমর্যাদার প্রকাশে বিন্দুমাত্র ঔদ্ধত্য ছিল না। তিনি তো বিদেশে একাধিক স্থানে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর দেশের অগণিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির উপায়ের সন্ধানে সাগরপাড়ি দিয়েছেন, পাশ্চাত্যে এসেছেন। কিন্তু তাঁর ভঙ্গিতে ভিক্ষার্থীর দৈন্য ছিল না। বলেছিলেন—আমার দেশেরও তোমাদের দেওয়ার মতো ঐশ্বর্য আছে, তা না পেলে তোমাদের সর্বনাশ আসন্ন—আমি তাই দেব। দিয়েওছিলেন। তাতে দাতার অহংকার ছিল না, ছিল শিক্ষকের ভালবাসা। তাই গ্রহীতাও তাঁকে আপন করে নিতে সংকোচ করেনি। কিন্তু এ-ব্যতীত তাঁর এই অপ্রতিরোধ্য আত্মবিশ্বাসের পিছনে আর কী ছিল? অধ্যাত্ম ঐশ্বর্যের কথায় যাব না। শুধু একটি কথা বলব—ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও সেটিকেই ধ্রুবতারারূপে তিনি গ্রহণ করেননি। সারা দুনিয়ার সভ্যতার আলো-আঁধারির হদিশ তিনি রাখতেন। সমালোচকের উন্নাসিকতায় নয়, ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আপামরের প্রতি সমদর্শী ভালবাসায়। এর অভ্রান্ত প্রমাণ তাঁর রচনাবলির পাতায় ধরা আছে। এই আলো তিনি নিবেদিতাকে দিয়েছিলেন।

চার

কেমন সেই শিক্ষা, কেমন সেই আলো—যা স্বামীজী দিয়েছিলেন নিবেদিতাকে? আধ্যাত্মিক আদানপ্রদানের কথা গুরুশিষ্যের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে চিরকাল। এই দস্তুর। কিন্তু নিবেদিতার জন্য প্রয়োজন ছিল আরও কিছুর। প্রয়োজন ছিল সংঘর্ষের। সেটি ঘটেছিল আলমোড়ায়। সে-সংঘর্ষের ইতিহাসে আজ আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু তার কারণটি আমাদের আলোচনায় অত্যন্ত জরুরি। সেটি নিবেদিতা-জীবনীতে বড় যথার্থ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা : ''তাঁহার [স্বামীজীর] অনন্যসাধারণ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা নিবেদিতা গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার আদর্শ এবং যুক্তিগুলি নির্বিচারে গ্রহণ করিবার মত মানসিক দীনতা নিবেদিতার ছিল না। তিনি নিজে যদি সাধারণ হইতেন, তাহা হইলে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের দ্বারা কেবল আকৃষ্ট নহে, অভিভূত হইতেন, এবং নিজ মতবাদ বা যুক্তি অনায়াসে বিসর্জন দিতেন। কিন্তু নিবেদিতার চরিত্রও অসাধারণ; তাঁহার ব্যক্তিত্বও কিছু কম নহে। তাহার উপর ছিল প্রচণ্ড তেজ ও অভিমান। অসহায়ভাবে নিজেকে বিলুপ্ত করিবেন, নিবেদিতার পক্ষে তাহা অসম্ভব।"[৪]

সংশয়ের কারণ নেই—মুক্তিপ্রাণাজীর এই বিশ্লেষণ নিবেদিতা-জীবন চর্চায় অপরিহার্য দিশা। সিস্টারের ব্যক্তিত্বের এই শক্তিশালী দিকটি বহুজনের স্মৃতিচারণে নানাভাবে এসেছে। দুটি উল্লেখ করব। প্রথমটি তাঁর ইংল্যান্ডের অকৃত্রিম সুহৃদ এরিক হ্যামন্ডের। তাঁর লেখনীতে[৫] পেয়েছি

প্রাক্-ভারতবর্ষ অধ্যায়ে নিবেদিতার ব্যক্তিত্বের চিত্র : ''আপাদমস্তক সজীবতায় মোড়া, বৈদগ্ধ্যের উদ্যমে টগবগে প্রাণবন্ত—এমনই ব্যক্তিত্ব যা একই সঙ্গে আকর্ষণ করে এবং আধিপত্য কায়েম করে; নিজের শিক্ষার্থীদের তিনি অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে উৎসাহিত করতেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর ভালবাসার পরিচয় শুধু তাঁর বিপুল পরিমাণ পঠনপাঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সেটি ছিল লেখকের মূল ভাবটিকে দ্রুত হৃদয়ঙ্গম করার পারদর্শিতায়। তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল সংগীতময় মাধুর্য, সেইসঙ্গে প্রশংসনীয় স্পষ্ট প্রকাশভঙ্গি।''

কিছু পরে হ্যামন্ড যোগ করছেন : ''তর্ক ও মতানৈক্যে অংশগ্রহণের মধ্যে তিনি মজা পেতেন। সবচেয়ে আনন্দ পেতেন তর্কের আসরে, যেখানে বক্তা ক্রমে উত্তপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। এই ধরনের আসরে মাঝে মাঝে তিনি আকর্ষক কিন্তু আপাত সম্পর্কহীন বিষয়ের অবতারণা করতেন শুধুমাত্র বক্তাকে উত্তেজিত করতে—আর সেই লড়াই যত তীব্র হত, ততই ছিল তাঁর মজা।''

প্রাচ্যে নিবেদিতার গুণগ্রাহীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যুজ্জ্বল। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক ছিল। বিশেষত উভয়ের অধ্যয়ন ও চর্চার আকাশপ্রতিম আগ্রহ ও আবেগ তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে যে-সেতু রচনা করেছিল তার আন্দাজ পাওয়া আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। নিবেদিতার দেহান্তের পর কবির শ্রদ্ধার্পণস্বরূপ রচনাটি আজ আমাদের জাতীয় সম্পদ। সেখানে অনাবিল উদারতায় নিবেদিতার সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গের মধ্যে অনমনীয় ব্যক্তিত্বের দিকটিও বাদ যায়নি। কবি লিখছেন, ''তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম কিন্তু সেইসঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেইসঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।''[৬]

এই দুটি উদাহরণ থেকে খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে স্বামীজীর হাতে মার্গারেট নোবলের নিবেদিতা হয়ে ওঠার অপরিহার্য পশ্চাৎপট। তবে এক্ষেত্রে আর একটি দিকেও মুক্তিপ্রাণাজী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকাটির কথাও বলেছেন, ''... স্বামীজী যদি কোমলভাবে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ নিবেদিতার নিকট উপস্থিত করিতেন, তাহা হইলে হয়তো হৃদয়ের আবেগবশতঃ নিবেদিতা কতকটা নত হইতেন। ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার পাত্রের নিকট স্বেচ্ছায় পরাজয়-স্বীকার বহু সময়ে ঘটিয়া থাকে—কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে। কিন্তু স্বামিজী সে ধার দিয়াও যান নাই। তাঁহার অভিধানে আপস বলিয়া কোন শব্দ ছিল না। বিশেষতঃ তিনি বুঝিয়াছিলেন, নিবেদিতার যে দৃঢ় অনুরাগ, তাহা একান্ত তাঁহারই প্রতি। এই ব্যক্তিগত বন্ধন নির্মমভাবে ছিন্ন করিবার জন্য তিনি দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন।''[৭]

এই দিকটির এখানেই ইতি টেনে আলমোড়ায় যে-পরিবর্তন নিবেদিতার জীবনে এসেছিল সেটির কথা অতি সংক্ষেপে নিবেদিতার রচনা[৮] থেকেই দেখে নেব।

পাঁচ

সময়কাল ১৮৯৮ সালের মে মাসের মাঝামাঝি। এইসময় নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে উত্তরভারত ভ্রমণে রয়েছেন। সঙ্গে শ্রীমতী সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলাউড, এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন ছিলেন। বর্ণিত ঘটনাটি আলমোড়ার। সেখানে মে মাসের ১৭ থেকে জুনের ১১ তারিখ সকাল অবধি কাটিয়ে তাঁরা কাঠগুদামের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। আলমোড়ার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে নিবেদিতা লিখেছেন, ''তিনি [স্বামীজী] একদিন বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, ''সত্যিই, তোমার মতো দেশভক্তি পাপের সমতুল্য!... আমি তোমাকে বস্তুত যা দেখাতে চাইছি তা এই যে, প্রায় বেশিরভাগ মানুষের কাজের মধ্য দিয়েই তাদের নিজস্ব ব্যক্তিস্বার্থের দিকটিই প্রকাশিত হয়। আর তুমি ক্রমাগত এই ধারণার বিরোধিতা করে দেখাতে চাইছ যে একটি বিশেষ জাতির সকলেই স্বর্গের দেবতাতুল্য। এমন অনড় অজ্ঞতা পাপাচার।''

যখন সিস্টার এদেশে আসেন সেসময় স্বদেশের প্রায় সবকিছুর প্রতি তাঁর এমনই আগলখোলা আনুগত্য ছিল। কিন্তু স্বামীজী চাইছিলেন শিষ্যাকে সমদর্শী হিসেবে গড়ে তুলতে। কারণ অদূর ভবিষ্যতে যে-ব্রত পালনের জন্য তিনি নিবেদিতার কথা ভেবেছিলেন সেখানে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারের এমন ভৌগোলিক সংকীর্ণতার স্থান ছিল না। বস্তুত নিজের সেইসময়কার সীমাবদ্ধতার সমালোচনা নিবেদিতা পরে নিজেই করেছেন। এই একই লেখায় অন্যত্র তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে জানিয়েছেন : ''অন্য একটি বিষয়ে এইসময় সেই শিষ্যা আর একধরনের একগুঁয়েমি দেখাতেন—সেটি পাশ্চাত্যের নারী- বিষয়ক ধারণার প্রতি তাঁর সহমত বা সমর্থন। আজ যখন তিনি সেসব নিজের নিরপেক্ষ সত্যানুরাগী মনের মাপকাঠিতে ফিরে দেখেন, তখন নিজের পূর্বতন আবেগের এই দুই সংকীর্ণতা তাঁর কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ ও অশিষ্ট বলে মনে হয়।'' অতঃপর নিজের সেই অনমনীয় সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গ এবং কীভাবে সেই সংকীর্ণতা থেকে তিনি মুক্তি পেলেন সে-বিষয়ে উল্লেখের পর নিবেদিতা জানিয়েছেন যে, আলমোড়ায় সেইসময়ে স্বামীজীর প্রভাতী কথোপকথন ক্রমেই তাঁর মনের গভীরে বাসা বাঁধা সমাজ, শিক্ষা ও শিল্প বিষয়ক প্রাচীন ধারণাবলির প্রতি আক্রমণের চেহারা নিত, অথবা তা ইউরোপীয় ও ভারতীয় ইতিহাস ও ভাবপ্রবণতার বিষয়ে দীর্ঘ তুলনামূলক আলোচনায় প্রবেশ করত—যার থেকে প্রায়শই অত্যন্ত মূল্যবান নানা দৃষ্টিভঙ্গি বা সিদ্ধান্ত উঠে আসত।

এইসময় স্বামীজীর কথোপকথনের মধ্যে আর একটি বৈশিষ্টের কথা নিবেদিতা পরে জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে আলোচনার মধ্যে অনেক সময় স্বামীজী খোলাখুলিভাবে কোনও এক দেশ বা সমাজের দোষত্রুটিগুলিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতেন। কিন্তু যখন তিনি আলোচনার সমাপ্তি টানতেন, তখন প্রায়শই মনে হত আসলে তিনি শুধু সেই দেশটির গুণাবলির দিকগুলিই মনে রেখেছেন। কেন তিনি এমন করতেন—তাও বলেছেন নিবেদিতা : ''তিনি সর্বদাই তাঁর শিষ্যাকে পরীক্ষা করতেন, এবং এই ধরনের আলোচনাদির উদ্দেশ্যই ছিল এমন একজনের সাহস ও আন্তরিকতার দিকটি যাচাই করা যিনি একদিকে ছিলেন নারী, অন্যদিকে ইউরোপীয়।''

এইভাবেই স্বামীজী তাঁর শিষ্যার মনোজগতে জমে থাকা অন্ধকার দূর করেছেন। ধীরে ধীরে সেই বিশুদ্ধ মনের আঙিনা ভরে উঠেছে সার সত্যের আলোয়। একথার অকাট্য উদাহরণ আছে নিবেদিতার সমগ্র রচনার মধ্যে। ভারতবর্ষে স্বামীজীর হাতে নিবেদিতার গড়ে ওঠার পর্বে এটি

ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এরই পরবর্তী শিক্ষাপর্বের কাল স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পাশ্চাত্যযাত্রা। সিস্টারের জীবনের এই যাত্রার একাধিক দিক ছিল। কিন্তু তার মধ্যে একটি দিক অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই পর্বে তিনি নিজের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারশক্তি নিয়ে পাশ্চাত্যে প্রবেশ করেছিলেন। সব মিলিয়ে আটলান্টিকের দুই পারে ছিলেন প্রায় আড়াই বছর। স্বামীজী যে সবসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন তা নয়। কিন্তু তাঁর শিক্ষা আর আশীর্বাদ কার্যকরী ছিল নিশ্চিত। এক নির্মোহ দৃষ্টি আর তীক্ষ্ণ বিচারশীল মন নিয়ে এই সময় নিবেদিতা নিজের পরিচিত পরিমণ্ডলের দিকে নতুনভাবে তাকালেন, বিচরণ করলেন মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময়। বিলাসবৈভবে মোড়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ঘুরতে ঘুরতে তিনি মানসচক্ষে প্রাচ্যের দিকে তাকালেন—দেখলেন যত না, অনুভব করলেন তারও বেশি। তাই ১৯০২ সালের প্রারম্ভে যখন ভারতে ফিরলেন, তখন তাঁর দৃষ্টিপথে ভারতবর্ষ বই অন্য কিছুর অগ্রাধিকার ছিল না। সেদিন ছিল ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০২ সাল, বোম্বাই শহরে এক বক্তৃতায় তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠল এক মহৎ উচ্চারণ, বললেন, ''প্রাচ্যের জীবন আমায় সর্বোচ্চ আত্মজ্ঞান দিয়েছে। আমার তীব্র খেদ কেন আমি অন্য দেশে জন্মগ্রহণ করেছি।''[৯] তাঁর জন্মগ্রহণের সার্ধশতবর্ষ পরে এই অত্যল্প বাক্যদুটিই সম্ভবত আজ তাঁর সর্বোচ্চ বিগ্রহ—আমাদের আভূমি নত হওয়ার পবিত্র প্রতীক।

তথ্যসূত্র

১। Gaston Camille Charles Maspero (1846-1916) : 'Egyptologist, developer of the Cairo Museum and author of popular books on Egyptian art. ...He was a key player in the establishment of Egyptian art discoveries...'(http://arthistorians.info masperog > accessed Feb. 9, 2020

২। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), পৃঃ ৮৬

৩। *The Complete Works of Swami Vivekananda* (Advaita Ashrama : Kolkata, 2011) Vol. V, p. 81

৪। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, *ভগিনী নিবেদিতা* (সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল : কলকাতা, ২০০৫), পৃঃ ৮৩ [এরপর *ভগিনী নিবেদিতা*]

৫। দ্রঃ Eric Hammond, *Sister Nivedita: An Impression of Earlier Years', Prabuddha Bharata,* 32/12 (December 1927), pp. 555-56

৬। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৬), খণ্ড ৯, পৃঃ ৬১৩
[অব্যবহিত পরের পঙক্তিতেই রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকৃতি অবশ্যই উল্লেখ্য : ''আজ এই কথা আমি অসংকোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর-এক দিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।'' (তদেব)]

৭। *ভগিনী নিবেদিতা*, পৃঃ ৯১

৮। দ্রঃ *Complete Works of Sister Nivedita*, Vol. 1, pp. 287-88

৯। দ্রঃ Ibid, p. 382

সহায়ক গ্রন্থ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু সম্পাদিত *Letters of Sister Nivedita in 2 volumes* (Advaita Ashrama, 2017)